শব্দার্থ ও টীকা

1

কবিতাপাঠ

1.1 প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথের মতে কবি নিজের অন্তর থেকে 'বচন' কথা বা শব্দসম্ভার সংগ্রহ করে আনন্দলোক সৃষ্টি করেন। শব্দে, সংগীতে, উপমায়, চিত্রকল্পে ও অনুভূতিকে প্রকাশই হচ্ছে কবিতা।

আনন্দলোক = আনন্দের জগৎ।

কবিতার দুটি দিক : (১) ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক (২) রূপগত দিক। প্রথমে কবিতায় কী ভাব বা বিষয় প্রকাশ পেয়েছে তা খুঁজে বার করে সেই ভাব বা বিষয়ের মধ্যে মানবজীবনের কোন্ সত্য প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনা করতে হবে। তারপর কবিতার ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কবিতার শব্দ, ছন্দ, অলংকার, চিত্রকল্প কীভাবে সাহায্য করেছে তার বিচার করতে হবে।

অলংকার = কবিতায় অলংকার বলতে বোঝায় অনুপ্রাস, উপমা, রূপক ইত্যাদি।

পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় প্রায় সব দেশের সাহিত্যের সূচনা হয়েছে কবিতা দিয়ে। তার কারণ সুদূর অতীতে যখন লেখার চল ছিল না তখন মানুষ সেসব ঘটনা, অনুভূতি বা আবেগকে স্মরণীয় করে রাখতে চাইত। সেই সব ঘটনা অনুভূতি বা আবেগকে ছন্দের বাঁধনে বেঁধে মনে রাখার চেষ্টা করত। তারপর লেখার চল হলে সেই ছন্দে বাঁধা রচনাগুলো লিখে রাখতে লাগল। এই ভাবে কবিতা লেখার সূত্রপাত হল। লেখার ক্ষেত্রে গদ্যের চল হয়েছে অনেক পরে। অন্য ভাষার সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেরও সূচনা হয়েছে কবিতা দিয়ে। দশম, দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে বৌদ্ধ সাধকেরা যেসব চর্যাপদ লিখেছিলেন সেগুলিই বাংলা কবিতা বা কাব্যসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। চর্যাপদগুলি ধর্মীয় অনুভূতিনির্ভর ছোটো কবিতা। এর পর নানা ঘটনা ও কাহিনি নিয়েও বড়ো আকারের কবিতা লেখা হল। শুরু হল আখ্যানকাব্য লেখা। এইভাবে বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়ে দেখা গেল দু ধরণের কবিতা (১) ছোটো আকারের খণ্ড কবিতা; (২) বড়ো আকারের আখ্যান কাব্য।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি :

- কবিতা কী সে সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করতে পারবেন;
- কবির হৃদয়াবেগ ফুটিয়ে তুলতে কবিতার ভাষা ও ছন্দ কীভাবে সাহায্য করে জানতে পারবেন;
- কবিতায় অলংকার ও চিত্রকল্প কী কাজ করে জানতে পারবেন;

শব্দার্থ ও টীকা

- প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের ধারা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- কবিতাতে চিত্রকল্পের স্থান কোথায় জানতে পারবেন;
- প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যের ধারা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন;
- ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা কাব্যের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- মহাকাব্য ও গীতিকবিতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

1.3 বিষয়ের রূপরেখা

ক) ছন্দ

কবিতার বাণীরূপের একটি প্রধান উপকরণ হল ছন্দ। কবিতায় মনের ভাবকে স্মরণীয় করে রাখা হয় বলে কবিতায় বাক্যগুলিকে বিশেষভাবে সাজাতে হয়। কবিতায় বাক্যগুলিকে নির্দিষ্ট মাপের ধ্বনি অনুযায়ী সাজানো হয়। কবিতার বাক্যে এই নির্দিষ্ট মাপের ধ্বনি তরঙ্গের বিন্যাসই হচ্ছে কবিতার ছন্দ। আর এই ধ্বনি তরঙ্গের ক্ষুদ্রতম মাপটি হচ্ছে তার মাত্রা।

বাংলা কবিতায় ছন্দের মাত্রাবিন্যাস নানাভাবে হয়। কারণ এই মাত্রাবিন্যাস বা মাত্রার পরিমাণ বা সংখ্যা নির্ভর করে শব্দের মধ্যে কয়টি দল আছে তার উপর। দল হচ্ছে কথা বলার সময় শব্দের যে অংশটি এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়। যেমন : 'জলধর'— এই শব্দটি আমরা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারি না, প্রথমে 'জ' উচ্চারণ করে তারপর একটু দম নিয়ে 'ল' উচ্চারণ করি, তারপর একটু দম নিয়ে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করি 'ধর'। এই জ^{১} ল^{১} ধর^{১} — জলধর শব্দের তিনটি দল। দল আবার দুই ভাগে বিভক্ত : মুক্ত দল ও রুদ্ধ দল। যে দলের শেষে স্বরধ্বনি আছে তাকে বলে মুক্ত দল, আর যে দলের শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে তাকে বলে রুদ্ধ দল। এ দিক থেকে জলধর শব্দের প্রথম দুটি 'জ' ও 'ল' হচ্ছে মুক্তদল। কারণ এদের উচ্চারণ শেষ হচ্ছে স্বরধ্বনি 'অ' দিয়ে, কিন্তু 'ধর' হচ্ছে রুদ্ধ দল, কারণ এর উচ্চারণ শেষ হচ্ছে ব্যঞ্জনধ্বনি 'ধর' দিয়ে। সাধারণ ভাবে সব ছন্দেই মুক্ত দলের মাপ হচ্ছে এক মাত্রা। কিন্তু রুদ্ধ দলের ক্ষেত্রে এক এক ছন্দে এক এক মাপ বা মাত্রা দেখা যায়। এ দিক থেকে ছন্দের মধ্যে তিনটি ধরন বা রীতি লক্ষ্য করা যায়।

এক ধরনের ছন্দে মুক্ত দল ও রুদ্ধ দল উভয়েরই মাপ এক মাত্রা। যেমন : 'নিরুদ্দেশ' এই রীতিতে নি/রুদ্/দেশ্ = ৩ মাত্রা। আর এক ধরনের ছন্দে মুক্ত দল একমাত্রা হলেও রুদ্ধদল দুই মাত্রা। যেমন: নি/রু/দ্/দে/শ্ = ৫ মাত্রা। তৃতীয় আর এক ধরনের ছন্দে মুক্ত দল এক মাত্রা হলেও শব্দের শেষের রুদ্ধ দল দুই মাত্রা। কিন্তু শব্দের ভেতরকার রুদ্ধদল একমাত্রা, যেমন: নি^{১} রুদ্^{১} দেশ^{২} (এখানে 'রুদ' রুদ্ধ দল হলেও শব্দের মাঝখানে আছে তাই একমাত্রা, কিন্তু রুদ্ধদল 'দেশ' শব্দের শেষে আছে বলে এর দুই মাত্রা) কাজেই বোঝা যাচ্ছে মুক্ত দলের মাত্রা সব ধরনের ছন্দেই একরকম হলেও রুদ্ধ দলের মাপ এক এক ছন্দে এক এক রকম। রুদ্ধ দলের মাত্রা তিন ধরনের ছন্দে তিন রকমের হয় বলে ছন্দবিজ্ঞানীরা বাংলা ছন্দরীতিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

১) প্রথম রীতির ছন্দটির নাম দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান:

যেমন,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান = ৪+৪+৪+১

শব্দার্থ ও টীকা

বিষ্টি = বৃষ্টি।
নদেয় = নদীতে।
কন্যে = কন্যা।
সিনান = স্নান।
এলো = খোলা।

১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১১ ১
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান = ৪+৪+৩+১

২) দ্বিতীয় রীতির ছন্দটির নাম কলাবৃত্ত বা ধ্বনি প্রধান:

যেমন,

১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
সা-গর জলে সি-নান ক-রি স-জল এ-লো চুলে = ৫+৫+৫+২

১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
ব-সিয়া ছি-লে উপল উ-প কূলে = ৫+৫+২

৩) তৃতীয় রীতির ছন্দটির নাম কলাবৃত্ত বা তান প্রধান:

যেমন,

১ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ১
রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে = ৮+৬

১ ১ ২ ২ ২ ২ ২ ১ ১
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে = ৮+৬

বাংলা ছন্দের এই তিন ধরনের মূল রীতিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন কবি ছন্দের ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে প্রধান। তিনি গদ্য ছন্দের কবিতাও লিখেছেন। একে বলে গদ্য কবিতা। রবীন্দ্রনাথের পরে আরও অনেকে গদ্য কবিতা লিখেছেন। আপনাদের পাঠ্য বইয়ে 'নাজমা' কবিতাটি এই রকম গদ্য কবিতার উদাহরণ।

পাঠগত প্রশ্ন 1.1

ক) দুদিকের অংশ ঠিকমতো যোগ করুন

(১) ছন্দ হচ্ছে	(i) একটি গদ্য কবিতা।
(২) মাত্রার পরিমাণ নির্ভর করে	(ii) শব্দের দল অনুযায়ী
(৩) দল হচ্ছে	(iii) ছন্দ তিন প্রকার।
(৪) ধরন অনুযায়ী	(iv) নির্দিষ্ট মাপের ধ্বনি অনুযায়ী কবিতার সাজানো বাক্য।
(৫) 'নাজমা' হচ্ছে	(v) এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত শব্দের অংশ।

1.4 খ) অলংকার

কাব্যকে কবি নানাভাবে সাজিয়ে তোলেন। তখন কাব্য হয়ে ওঠে রূপময়। কাব্যকে সাজিয়ে তোলার জন্য যে সব সাজসজ্জার ব্যবহার করা হয় সেগুলিকেই বলা হয় অলংকার। কাব্যে অলংকার গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যে সৌন্দর্য সৃষ্টির সব উপাদানকেই অলংকার বলা হয়েছে। বাক্যকে শব্দ ও অর্থ দিয়ে সাজিয়ে দিলেই কাব্য হয় না। এইজন্য কাব্যের বাক্যে দুভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি বা অলংকার প্রয়োগ করা হয়। ১) কাব্যের শব্দ ব্যবহারের

শব্দার্থ ও টীকা

মধ্যে, (২) বাক্যের অর্থবিস্তারের মধ্যে। এজন্য অলংকার দুই শ্রেণির: শব্দালংকার ও অর্থালংকার।

শব্দের সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য যে অলংকার ব্যবহার করা হয় তাকে বলে শব্দালঙ্কার। যেমন:

'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে'।

এখানে 'গ' ধ্বনিটি বিভিন্ন শব্দের মধ্য দিয়ে বার বার ঘুরে ঘুরে এসে একটা ধ্বনি-সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। এই সৌন্দর্য শব্দের বিশেষ কৌশলী প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। এজন্য এখানে শব্দালংকারের প্রয়োগ ঘটেছে। এই শব্দালংকারের নাম **অনুপ্রাস**। অনুপ্রাস ছাড়া আরও দুটি বিশিষ্ট শব্দালংকার **শ্লেষ** ও **যমক**।

শ্লেষ— কবি যখন বিভিন্ন অর্থে একই শব্দ প্রয়োগ করেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে পাঠকও বিভিন্ন অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ করেন তখন শ্লেষ অলংকার। যেমন :

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর
(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা)

এখানে ঈশ্বর কবির নাম ও ভগবান এই দুই অর্থে বোঝাচ্ছে। প্রভাকরেরও দুই অর্থ ১) সূর্য ২) ঈশ্বর গুপ্ত।

যমক— দুই বা তার বেশি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনি সমেত নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হলে হয় যমক অলংকার। যেমন, 'ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে'। এখানে প্রথম 'ভারত' কবি ভারতচন্দ্র, দ্বিতীয় 'ভারত' ভারতবর্ষ।

অর্থালঙ্কার— যে অলংকার একান্তভাবেই অর্থের উপর নির্ভর করে এবং কাব্যের শব্দগুলিকে পরিবর্তিত করে সেখানে অন্য সমার্থক শব্দ বসিয়ে দিলেও যে অলংকার একই থাকে তার নাম অর্থালংকার।

যেমন: 'গৌর নাগর রসের সাগর
ভাবের তরঙ্গ তায়' — উদ্ধবদাস

এখানে গৌরাঙ্গ দেবকে সাগর ও তাঁর ভাবলীলাকে সাগরের তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যার তুলনা করা হয় তাকে বলে **উপমেয়**। আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে বলা হয় **উপমান**। যেখানে উপমেয় ও উপমানকে অভিন্ন মনে করা হয় সেখানে **রূপক অলংকার** হয়। অলংকারের বর্তমান উদাহরণটিও রূপক অলংকারের।

যেমন : 'মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে।'

এখানে উপমেয় 'মন'-এর সঙ্গে উপমা 'মাঝি'র তুলনা করা হয়েছে।

পাঠগত প্রশ্ন : 1.2

ক) ঠিক উত্তর আলোচিত অংশ থেকে বেছে নিয়ে লিখুন

(১) কাব্যে অলংকার হল .....।

(২) অলংকার শাস্ত্র হচ্ছে .....।

শব্দার্থ ও টীকা

(৩) যমক অলংকার হচ্ছে .....।

(৪) উপমেয় হচ্ছে .....।

খ) উত্তর দিন

(১) শব্দশ্লেষের উদাহরণ দিন।

(২) উপমানের উদাহরণ দিন।

1.5 গ) চিত্রকল্প

কবি তাঁর কল্পনায় শব্দ ও বাক্যের সম্ভারে সাধারণকে অসাধারণ রূপময় করে তোলেন। ভাবকে রূপময় করে তোলার জন্য কবি দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন (১) উপমা বা উপমেয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক অলংকার প্রয়োগ (২) চিত্রকল্পের প্রয়োগ যা অলংকারের মতো সাদৃশ্যধর্মী হয়েও অলংকারের চেয়ে আরো গভীর ও তাৎপর্যময়। যখন সরু ও টানা টানা চোখের সৌন্দর্য বর্ণনা করার জন্য বলা হয় পটোল-চেরা চোখ, তখন শুধু চেরা-পটোলের বাইরের আকারের সঙ্গে সাদৃশ্য বোঝানো হয়। এতে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে তা সাদৃশ্যমূলক অলংকার প্রয়োগের ফলে। এতে শুধু ছবি আছে, কিন্তু গভীর কোনো ব্যঞ্জনা নেই। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ যখন বলেন,

পদ্ধতি = রীতি, উপায়।
সাদৃশ্য = মিল।

> 'সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর
> তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
> পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।'

ব্যঞ্জনা = রীতি, উপায়।
সাদৃশ্য = ভাব।

নীড় = বাসা।

এই ব্যঞ্জনা অলংকার থেকে আসে নি, এসেছে আরও তাৎপর্যময় এক ছবির মধ্যে দিয়ে। এই ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্রই হচ্ছে কবিতার চিত্রকল্প। তখন কবি চোখের সঙ্গে পাখির নীড় বা বাহ্য আকারের সাদৃশ্য বোঝান না, বোঝান বনলতা সেনের চোখের মধ্যে পাখির নীড়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ব্যঞ্জনা।

পাঠগত প্রশ্ন : 1.3

ক) একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) ভাবকে রূপময় করে তোলার জন্য কবি কটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন?

(২) 'পাখির নীড়ের মতো চোখ'— কবিতাংশটি কোন্ অলংকারের উদাহরণ?

(৩) বনলতা সেনের চোখে পাখির নীড়ের কীসের ব্যঞ্জনা রয়েছে?

(৪) বনলতা সেন কবিতাটি কার লেখা?

খ) শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান।

(১) ভাবকে রূপময় করার জন্য কবি যে পদ্ধতি দুটি অবলম্বন করেন সেগুলির নাম (i) ..... (ii) .....

(২) 'কাশীরাম দাস' কবিতাটি ..... -এর উদাহরণ।

1.6 বাংলা কবিতার প্রাচীন ও মধ্যযুগ

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা কাব্যধারায় মূলভাব ছিল ভক্তিবাদ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য 'চর্যাপদ' বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধর্মসাধনার সংগীত। খ্রিষ্টীয় দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা এই চর্যাগীতিগুলি রচিত। 'চর্যাপদ'ই আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন। বৌদ্ধ সাধকদের সাধন প্রণালী ও দর্শন তত্ত্ব নানা ধরণের রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্পের আভাষে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। আবার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ— গাছ, নদী, আকাশ, ফুল, ফল, বাংলার তখনকার সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা, তাদের পোশাক-আশাক, অলংকার, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত খাদ্য, বাসনপত্র, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। তবে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ ডোম-শবর-শুঁড়ি প্রভৃতি মানুষের জীবনযাত্রাই প্রাধান্য পেয়েছে চর্যার পদে।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্য দুটি ধারায় প্রবাহিত।

(ক) আখ্যানকাব্য, (খ) খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য। আখ্যানকাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্য, চরিত সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য প্রধান। গীতিকাব্যের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্ত পদাবলি ও বাউলগান অন্তর্গত।

নীচে একটি ছকে আখ্যানকাব্যের বিষয়গত বিভাজনটি দেখান হল—

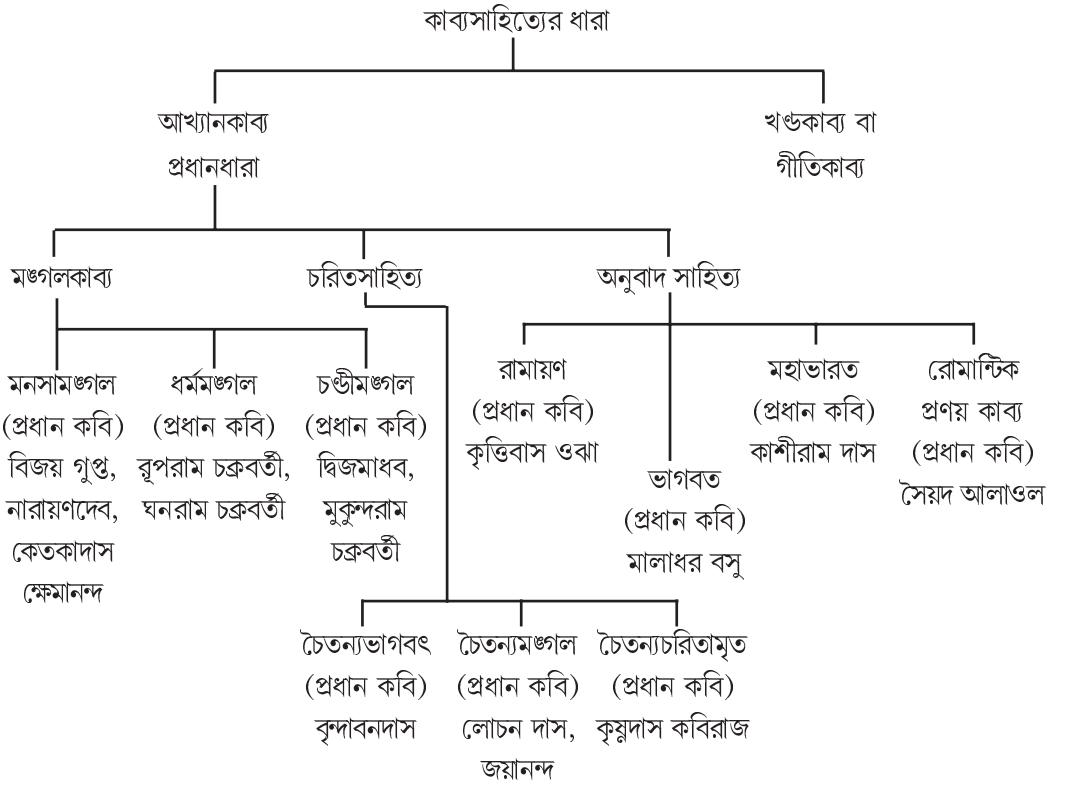

ক) আখ্যানকাব্য :

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় শাখা হল আখ্যানকাব্য। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এর কালপর্ব। যে কাব্য আখ্যান অর্থাৎ কাহিনিনির্ভর তাকে আখ্যানকাব্য বলে। আখ্যানকাব্য কাহিনিপ্রধান। কাহিনি বড়োও হতে পারে আবার ছোটোও হতে পারে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। বিপদে ভক্তকে উদ্ধার

শব্দার্থ ও টীকা

করেন। যাঁরা দৈব নির্দেশ অমান্য করেন তাঁদের কপালে জোটে দারুণ দুর্ভোগ। নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে মর্তবাসীরা ঐ আরাধ্য দেবতা বা দেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন, তারপর ভক্তের মধ্য দিয়ে তাঁর পূজা প্রচার ও বিজয়গাথা বর্ণনা করে তিনি স্বর্গে ফিরে যান। প্রতিভাবান কবিদের লেখনীতে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব। বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গলের রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গলের এবং দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলের বিখ্যাত কবি।

আখ্যানকাব্য ধারায় অনুবাদ সাহিত্যের শাখাটিও বড় স্থান দখল করে আছে। বাংলার লোকসাধারণের জন্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হয়। তবে এগুলি বাংলার লোকসংস্কৃতির সাথে মিশে যাওয়ার জন্য কবিরা আক্ষরিক অনুবাদ করলেন না, করলেন ভাবানুবাদ। এই অনুবাদ সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য ভক্তিবাদ। কৃত্তিবাস 'রামায়ণ'-এর, কাশীরাম দাস 'মহাভারত' এবং মালাধর বসু 'ভাগবত'-এর শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। এছাড়া ইসলামি শাসনকর্তাদের আনুকূল্যে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন ভাষায় লেখা রোমান্টিক প্রণয়কাব্য বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। যেমন, পঞ্চদশ শতকে গৌড় দরবারের অনুগ্রহপ্রাপ্ত কবি শাহ মুহম্মদসগীর 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের অনুবাদ। সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভার কবি সৈয়দ আলাওল 'পদ্মাবতী' অনুবাদ করেন। আপনাদের পাঠ্য বইতে 'পদ্মাবতী' কাব্যের একটি অংশ সংকলিত হয়েছে।

আখ্যানকাব্য ধারার অন্যতম একটি শাখাচরিত কাব্য। বাংলা ভাষায় চরিত সাহিত্য ধারার উৎস চৈতন্যদেব। যুগনায়ক চৈতন্যদেব প্রেম, ভক্তি দিয়ে বাংলাদেশে এক ভাব বিপ্লবের সূচনা করলেন। তাঁর মানবপ্রেমের মূলকথা কৃষ্ণভক্ত অচ্ছুত চণ্ডালও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণতুল্য হতে পারে। চৈতন্যের ব্যক্তি চরিত্রের মহিমা বর্ণনা সাহিত্যে তথ্যনিষ্ঠ সমাজ দর্শন ও ইতিহাস চেতনার সূত্রপাত ঘটাল। চৈতন্যচরিতকাব্য মূলত ভক্তির কাব্য। তাঁর চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাব্য রচনা করলেও সেখানে মহাপ্রভুর বংশ পরিচয়, বাল্যজীবন, কৈশোর, যৌবন, বিবাহ, সন্ন্যাস প্রভৃতি জীবনবৃত্তান্ত কাব্যে স্থান পেয়েছে। দেবদেবী অধ্যুষিত অলৌকিক বাংলা সাহিত্য জগতে চৈতন্যচরিত সাহিত্য নতুন প্রবণতার সৃষ্টি করল। বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' লোচনদাস ও জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন। এগুলি সবই চরিত-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

অধ্যুষিত = অধিষ্ঠিত, অধিবাসীযুক্ত।

পাঠগত প্রশ্ন : 1.4

ক) একটি দুটি শব্দে উত্তর দিন :

(১) প্রাচীন যুগের কাব্যের মূল ভাব কী ছিল?

(২) চর্যাপদ কীসের নিদর্শন?

(৩) আখ্যান কাব্য রচনার সূচনা পর্বটি কবে ঘটে?

(৪) বাংলা সাহিত্যে অনুবাদকর্ম কখন শুরু হয়?

(৫) বাংলায় চরিত-সাহিত্যের উৎস কে?

(৬) মঙ্গলকাব্যধারার দুজন প্রধান কবির নাম লিখুন।

1.7 খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য

গীতিকাব্য হল গীতিমূলক ছোটো কবিতা, যার মধ্যে ধারাবাহিক কাহিনি নেই। গীতিময়তা এই কবিতার প্রাণ। মধ্যযুগের গীতিকাব্যের ধারা মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত। বৈষ্ণবপদাবলি, শাক্ত পদাবলি ও বাউলগান। এই তিনটি ধারা নানা ভাবে প্রবাহিত, পরবর্তী পৃষ্ঠায় তা একটি ছকে দেখান হল—

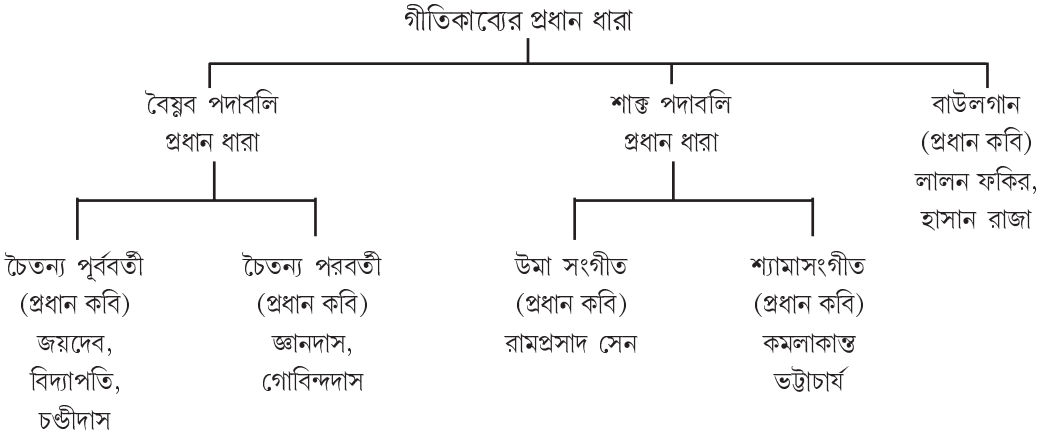

বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম। গীতিময়তা বৈষ্ণব পদাবলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানব হৃদয়ের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি, উৎকণ্ঠা, প্রেম মাধুর্য, অতীন্দ্রিয় জীবন বোধ, রোমান্টিক ভাববিহ্বলতা, পাওয়া না-পাওয়ার, মিলন বিরহের আনন্দ-বেদনা বৈষ্ণব পদাবলিতে ফুটে উঠেছে। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যকে চৈতন্যপূর্ব এবং চৈতন্য পরবর্তী দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব কবিদের পদাবলি ছিল মানব-মানবীর লৌকিক প্রেমকাহিনি। চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলির স্বরূপটি আলাদা। চৈতন্য পরবর্তী কবিতা চৈতন্যলীলার প্রভাবে ঐশ্বর্যময়। চৈতন্য ভক্তরা বিশ্বাস করতেন মহাপ্রভু অন্তরে কৃষ্ণ, বাইরে রাধা, ফলে চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলি সাহিত্যে আসে ভাবের নবরূপায়ণ। বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শন নতুন করে গড়ে ওঠে। চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা সকলেই ভক্ত, তাঁরা রাধাকৃষ্ণের উপাসক। তাই রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদনই হল কাব্যের বিষয়। চৈতন্য পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব কবি হলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস। চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব কবি বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস উল্লেখযোগ্য।

গীতিকাব্য ধারার উল্লেখযোগ্য শাখা হল শাক্ত পদাবলি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাপ্রকার আঘাতে জনজীবন বিপর্যস্ত। এই ঘোর দুর্দিনে শাক্তকবিরা অনন্ত-শক্তিময়ী 'কালভয়হারিনী' বরাভয়দাত্রী জগজ্জননীর কাছে উদ্ধারের প্রতিকার চাইলেন। কালীকে শাক্তকবিরা কোমলে কঠোরে রূপ দিলেন। তিনি হলেন মা। কালী মাতৃরূপে আরাধিত হলেন। এতে ভক্তিভাবের প্রাধান্য। কালীমাতা বা শ্যামা মাকে নিয়ে রচিত হল শ্যামাসংগীত। আবার শাক্ত পদাবলি উমাসংগীতে কালী বাঙালির ঘরের কন্যারূপে চিত্রিত। আগমনি ও বিজয়া বিষয়ক শাক্তগীতিতে মাতৃহৃদয়ের স্নেহ, বাৎসল্য ফুটে উঠেছে। শাক্ত কবিরা বাঙালি জাতির বাস্তব জীবন ও ঘরসংসারের সুখ-দুঃখের ছবি এঁকেছেন তাঁদের কবিতায়। সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শ্যামাসংগীত এবং রামপ্রসাদ সেন উমাসংগীত রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 1.5

যেটি ঠিক সেটি বেছে নিন :

(১) মধ্যযুগের গীতিকাব্য কটি ভাগে বিভক্ত? (দুটি / তিনটি / চারটি)

(২) বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়বস্তু কী? (রাধাকৃষ্ণের প্রেম / সাধকদের সাধনা / মুক্তির সাধনা)

(৩) শাক্ত পদাবলি কোন যুগের? (আদি যুগের / মধ্য যুগের / আধুনিক যুগের)

1.5 ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বাংলা কাব্য

অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে বাংলা কাব্য আধুনিকতার পথে পা বাড়ায়। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা কাব্যের রূপটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের কাব্যধারা দুটি পর্বে বিভক্ত। (১) ইংরেজ শাসন পর্ব, (২) স্বাধীনতা উত্তর বা রবীন্দ্রোত্তর পর্ব। এই দুই পর্বে বাংলা কবিতা নানা ধারায় প্রবাহিত। উপরিউক্ত বাংলা কাব্যধারার ছকটি নীচে করে দেখানো হল—

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা কাব্য

- ইংরেজ শাসন পর্ব
- স্বাধীনতা উত্তর বা রবীন্দ্রোত্তর পর্ব

ইংরেজ শাসন পর্বে বা নবজাগরণের পূর্বে রচিত বাংলা কবিতায় দেখা গেছে মধ্যযুগের ধারার অনুবর্তন। কবিতায় কবির কল্পনায়, ভাবনায় আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যটি উল্লিখিত ছিল না। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো বাঙালির চিন্তাজগতে আনে নব চেতনা। সেই চেতনার আলো পড়ে কবিদের কাব্যে এবং সাহিত্যে। বাংলা কবিতা মধ্যযুগের পয়ার, ত্রিপদী ছেড়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আখ্যানকাব্য রচনা শুরু হয়। নতুন স্বাদের সনেট বাংলা কবিতায় নতুনত্ব আনে। নবচেতনার আলোয় কবিরা মহাকাব্য লিখে বাংলা কবিতাকে অন্য মাত্রা দিলেন। আবার রবীন্দ্র পরবর্তী বা স্বাধীনতা উত্তর কবিরা সাহিত্যে আনেন নতুনত্বের স্বাদ। রবীন্দ্রপর্ব এবং রবীন্দ্রপরবর্তী পর্বে রবীন্দ্রধারার অনুগামী কিছু কবির পাশাপাশি কিছু রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত কবি সাহিত্যকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেন। আবার রবীন্দ্র-নিরপেক্ষভাবে কোনো কোনো কবি নিজস্ব শৈলীতে কাব্য রচনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মানবিক মূল্যবোধের সঙ্কট প্রতিফলিত হয় অনেকের কাব্যে। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র এই ধারার উল্লেখযোগ্য কবি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা কাব্য-ধারার বিভাজনটি ছকে দেখানো হল—

ইংরেজ শাসনপর্ব ও স্বাধীনতা উত্তর বা রবীন্দ্রোত্তর পর্বের কাব্যধারা

- আখ্যানকাব্য
  - উদাহরণ
  - পদ্মিনী উপাখ্যান (রঙ্গলাল)
  - তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (মধুসূদন দত্ত)
  - পলাশীর যুদ্ধ (নবীনচন্দ্র সেন)
- মহাকাব্য
  - মেঘনাদবধ কাব্য (মধুসূদন দত্ত)
  - বৃত্রসংহার (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
  - রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস (নবীনচন্দ্র সেন)
- গীতিকবিতা (লিরিক)
  - রবীন্দ্রপূর্ব
    - বিহারীলাল চক্রবর্তী
    - দেবেন্দ্রনাথ সেন
    - সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
    - মানকুমারী বসু
    - গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
  - রবীন্দ্র রচনা
    - প্রথমকাব্য 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২ খ্রি:)
    - শেষকাব্য 'শেষ লেখা' (১৯৪১ খ্রি:)
    - (এই কাব্যধারা নানা পর্বে বিভক্ত)
  - রবীন্দ্র অনুগামী
    - কালিদাস রায়
    - কুমুদরঞ্জন মল্লিক
    - করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
    - যতীন্দ্রমোহন বাগচি
    - প্রভৃতি
  - রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্ন ভাবনার কবি
    - কাজী নজরুল ইসলাম
    - যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
    - বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র
    - জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
    - সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সন্ধিক্ষণ = এককালের অবসান ও অন্যকালের আগমনের সময়

শব্দার্থ ও টীকা

সনেট = চতুর্দশপদী কবিতা

শব্দার্থ ও টীকা

উনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা কাব্যধারা প্রধানত তিনটি খাতে প্রবাহিত। সেগুলি হল উল্লিখিত (ক) আখ্যানকাব্য, (খ) মহাকাব্য ও (গ) গীতিকবিতা।

ক) আখ্যানকাব্য :

আখ্যানকাব্য কাহিনিমূলক কাব্য। কাহিনিই প্রধান। তবে উনিশ শতকের আখ্যানকাব্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথার বদলে এল মানুষের নিজের জীবনকথা। বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকে আখ্যানকাব্যের প্রথম রচয়িতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' প্রভৃতি কাব্যগুলি তাঁর লেখা। অন্যান্য আখ্যানকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লেখা আখ্যানকাব্য হল 'আশাকানন', 'বীরবাহু' প্রভৃতি। নবীনচন্দ্র সেনের উল্লেখযোগ্য আখ্যানকাব্য হল— 'পলাশীর যুদ্ধ'।

খ) মহাকাব্য :

উনবিংশ শতকে আর-এক শ্রেণির আখ্যানকাব্য রচিত হল যা মহাকাব্য। মহাকাব্য দুই শ্রেণির হয়। (১) আর্য বা প্রাচীন মহাকাব্য, (২) আলংকারিক বা সাহিত্যিক মহাকাব্য। প্রাচীন বা আর্য মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য হল এই শ্রেণির মহাকাব্যের মধ্যে সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে।

বৈশিষ্ট্য:

পটভূমি = অধ্যায়
সর্গ = অধ্যায়

মহাকাব্যের কাহিনি হবে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক। নায়ক হবে সদ্‌গুণের অধিকারী। কাহিনির পটভূমি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল। মহাকাব্যে আটটি সর্গ থাকবে। বীররস প্রধান। পৃথিবীতে এই ধরনের মহাকাব্য বাল্মিকীর 'রামায়ণ', ব্যাসদেবের 'মহাভারত', গ্রীসের হোমারের লেখা 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি'। উনবিংশ শতকে বাংলায় মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখলেন আলংকারিক মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ'। রামায়ণের কাহিনি নিয়ে রচিত, নয়টি সর্গে বিভক্ত। মহাকাব্য হিসেবে 'মেঘনাদবধ' বাংলা কাব্য ধারার বিষয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। এই ধারার অন্যান্য কাব্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য', নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রাভাস'।

গ) গীতিকাব্য :

ইংরেজিতে যাকে লিরিক বলা হয়, বাংলায় তাকে বলা হয় গীতিকবিতা। গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ। মধ্যযুগের গীতিধর্মী খণ্ড কবিতার সঙ্গে এর মিল হল, এই কবিতাও খণ্ড কবিতার মতো আকারে ছোটো। কিন্তু সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মধ্যযুগের খণ্ড কবিতার থেকে আধুনিক গীতিকবিতার পার্থক্য বেশি। মধ্যযুগের পদাবলির মতো খণ্ডকবিতার থেকে আধুনিক গীতিকবিতার পার্থক্যটাই বেশি। মধ্যযুগের পদাবলির মতো খণ্ডকবিতায় কবির ধর্মীয় অনুভূতি গানের সুরে ধরা পড়ত। কিন্তু আধুনিক গীতিকবিতা গাওয়ার জন্য রচিত নয়। কবির নানা ব্যক্তিগত অনুভূতিই এখানে প্রকাশ পায়। বিহারীলাল চক্রবর্তীর লেখনীতে আধুনিক গীতিকবিতা রচনার সূত্রপাত। তাঁর 'নিসর্গসন্দর্শন', 'সাধের আসন', 'সারদামঙ্গল' এই ধারার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ', 'বঙ্গভূমির প্রতি', প্রভৃতি কবিতাগুলি গীতিরসে পূর্ণ। এছাড়া দেবেন্দ্রনাথ সেনের লেখা 'ফুলবালা', 'ঊর্মিলাকাব্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ গীতিকবিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দ্বিজেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গীতিকবিতা লিখেছেন।

বিংশ শতকে গীতিকাব্যের ধারাটি এখনও বয়ে চলে আসছে কবিদের লেখায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনবিংশ ও বিংশ শতকে এই দুই ধারার গীতিকবির সার্থক উত্তর সাধক। 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 1.6

ক) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) কোন্ সময় থেকে বাংলা কাব্যের রূপটি পরিবর্তিত হয়ে যায়?

(২) ঊনবিংশ শতকে বাংলা কাব্য ধারাগুলি উল্লেখ করুন।

(৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কাব্যে কীসের প্রতিফলন ঘটে?

(৪) আখ্যানকাব্য ধারার উনিশ শতকের প্রথম রচয়িতা কে?

(৫) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি মহাকাব্যের নাম লিখুন।

খ) শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান :

(১) 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্যদুটি লিখেছেন .....।

(২) মধুসূদন দত্তের লেখা মহাকাব্যটির নাম .....।

(৩) বিহারীলাল ছাড়া দুজন গীতিকবির নাম (১) ..... (২) .....।

(৪) দুজন মহিলা গীতিকবির নাম (১) ..... (২) .....।

1.9 আপনি যা শিখলেন

1. কবিতা কী এবং কবিতার সংজ্ঞা;
2. যথাযথ শব্দ চয়ন বা ধ্বনি-বিন্যাস বাক্যকে কাব্যে পরিণত করে;
3. কবিতায় ছন্দ ও অলংকার কবিতাকে গতিময় ও সৌন্দর্যে ভরে তোলে;
4. চিত্রকল্পের সাহায্যেও কবিরা ভাবটি ফুটিয়ে তোলেন;
5. প্রাচীন যুগের কাব্য সম্পর্কে জ্ঞান;
6. মধ্যযুগের কাব্য ও কাব্যের রীতি সম্পর্কে জ্ঞান;
7. প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবি ও কাব্য সম্পর্কে জ্ঞান;
8. আধুনিক যুগের কবি ও কাব্য সম্পর্কে জ্ঞান;
9. মহাকাব্যের রূপটি জানতে পারা;
10. গীতিকাব্য সম্পর্কে ধারণালাভ।

শব্দার্থ ও টীকা

1.10 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলির অনধিক ৬ থেকে ৮টি বাক্যে উত্তর দিন :

1. কবিতা কী? কবিতা পড়তে গেলে কবিতার কোন্ কোন্ দিকে দৃষ্টি দিতে হয়?
2. কবিতায় ছন্দের গুরুত্ব কতখানি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।
3. কবিতার অলংকার কীভাবে ব্যবহৃত হয় একটি দৃষ্টান্ত সহযোগে লিখুন।
4. অলংকারের সঙ্গে চিত্রকল্পের তফাত কোথায় উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।
5. কবি কীভাবে ভাবকে চিত্ররূপ দান করেন লিখুন।
6. চর্যাপদে সমকালীন বাংলার সম্বন্ধে কী জানা যায়?
7. সাহিত্যের কোন ধারা অবলম্বন করে মধ্যযুগের কাব্য প্রবাহিত হয় লিখুন।
9. বাংলা অনুবাদ কাব্যের বৈশিষ্ট্য কী?
10. কাকে অবলম্বন করে চরিতকাব্য লিখিত হল?
11. মধ্যযুগের গীতিকাব্যধারায় চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলির বৈশিষ্ট্য লিখুন।
12. শাক্ত পদাবলির বৈশিষ্ট্য লিখুন।
13. ঊনবিংশ শতকে রচিত মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

1.11 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

1.1 ক) (১) (iv)

(২) (ii)

(৩) (v)

(৪) (iii)

(৫) (i)

1.2 ক) (১) কাব্যকে সাজিয়ে তোলার জন্য সাজসজ্জা।

(২) অলংকার সম্বন্ধীয় শাস্ত্র।

(৩) দুভাবে।

(৪) শব্দালংকার।

(৫) যার তুলনা করা হয়।

খ) (১) কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর / যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

শব্দার্থ ও টীকা

(২) যার সঙ্গে তুলনা করা হয়।

1.3 ক) (১) দুটি।

(২) চিত্রকল্পের।

(৩) নিশ্চিন্ততার ব্যঞ্জনা।

(৪) জীবনানন্দ দাশ।

খ) (১) (i) উপমা ও উপমেয়-র সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক অলংকার।
(ii) চিত্রকল্প।

(২) গীতিকবিতা।

1.4 (১) ভক্তিবাদ।

(২) প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধর্মসাধনার সঙ্গীত।

(৩) পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত।

(৪) মধ্যযুগে।

(৫) চৈতন্যদেব।

(৬) বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব।

1.5 (১) তিনটি।

(২) রাধাকৃষ্ণের প্রেম।

(৩) মধ্যযুগের।

1.6 ক) (১) ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে।

(২) ১. রবীন্দ্রপর্ব ২. রবীন্দ্রোত্তর পর্ব।

(৩) মানবিক মূল্যবোধের সংকট।

(৪) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৫) বৃত্র সংহার।

খ) (১) হোমার।

(২) মেঘনাদবধ।

(৩) দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ।

(৪) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়।

1.12 সমধর্মী গ্রন্থ

1. সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি - উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
2. ছন্দ সোপান - প্রবোধচন্দ্র সেন
3. অলঙ্কার চন্দ্রিকা - শ্যামাপদ চক্রবর্তী